# মুক্তিসংগ্রামে ছাত্র ইউনিয়ন

মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং তার বিকৃতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে হরহামেশাই বিভিন্ন ধরণের আলোচনা শোনা যায়। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত এসব আলোচনার অনেকক্ষেত্রেই ইতিহাসের বিকৃতি যেমন ঘটছে, ইতিহাসের খণ্ডিত ও অতিসরলীকৃত বিশ্লেষণ, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একক কৃতিত্ব ও কর্তৃত্ব দাবি করার অশুভ প্রবণতা, মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার বিভ্রান্তিকর ও খন্ডিত উপস্থাপনও দেখা যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। মুক্তিযুদ্ধের ৪০ বছর পর, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী যে প্রজন্ম প্রস্তুত হচ্ছে সামনের দিনের বাংলাদেশকে প্রগতির পথ ধরে এগিয়ে নেবার অভিযাত্রায়, নেতৃত্ব দেবার জন্য, তাদের কাছে গৌরবময় সেই ইতিহাসের সঠিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হাজির করা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে নানা পটপরিবর্তনে এদেশে প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানপন্থীরা ক্ষমতাকাঠামোর আশেপাশে থেকে সেই গৌরবময় ইতিহাসকে বিকৃত করেছে। 'মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি' দাবিদারদের অনেকে বিচ্যুত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা থেকে। তারই প্রমাণ আমরা পাই সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে, যেখানে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে রেখে দেয়া হয়েছে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম', ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনীতি করার সুযোগ এবং 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম'। এ সময়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় যারাই পালাক্রমে আসছে, তারা তাদের শাসন-শোষণ কাঠামো টিকিয়ে রাখতে, শ্রেণীস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থ হাসিল করতে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। এজন্যই মুক্তিসংগ্রামের সঠিক, নির্মোহ, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সংস্পর্শে না আসতে পারায় এদেশের তরুণ প্রজন্ম গৌরবময় সেই ইতিহাসের উত্তরাধিকার ও দায় বহন করা থেকে অনেকটাই বঞ্চিত হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তার প্রেক্ষাপট, ঐতিহাসিক বাস্তবতা সম্পর্কিত বিস্তারিত বিশ্লেষণ জরুরী। অনুধাবন করা প্রয়োজন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কেবল নয় মাসের যুদ্ধের ইতিহাস নয়। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচনা করতে, মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য নানামাত্রিক সংগ্রামের প্রয়োজন হয়েছে। শোষিত, বঞ্চিত এদেশের মানুষ সংগ্রাম করেছে নিজেদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক মুক্তির তাগিদে। মুক্তিযুদ্ধের ভ্রুণ সৃষ্টি হয়েছিল ব্রিটিশ শাসন শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধপর্বের সূচনাকাল থেকে। শতাব্দীর অধিককাল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এবং দুই যুগ ধরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগঠিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক

মুক্তির লড়াইয়ে সে ভ্রূণ বিকশিত হয়েছে, নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে তা পেয়েছে পূর্ণাঙ্গ আকার-আকৃতি এবং ভূমিষ্ঠ হয়েছে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি।

মুক্তিসংগ্রামের ঐতিহাসিক পটভূমি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারাবাহিক বিকাশ সম্পর্কিত আলোচনায় অনিবার্যভাবেই এদেশের ক্রমশ গড়ে ওঠা বাম-প্রগতিশীল শক্তির গৌরবময় ভূমিকা, আত্মত্যাগ এবং নিরন্তর সংগ্রামের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। এদেশের বাম প্রগতিশীল শক্তির নেতৃত্বে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মেহনতী মানুষ, প্রগতিশীল মধ্যবিত্তের ধারাবাহিক রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসকে বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। অথচ মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে বামপন্থীদের ভূমিকা নিয়ে নানা বিতর্ক, ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের অবদানকে কোথাও কোথাও খণ্ডিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, কোথাও একেবারেই ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সৃষ্টিতে, মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ছাত্র ইউনিয়নের প্রগতিশীল অগ্রগামী ভূমিকাকেও নতুন প্রজন্মের কাছ থেকে দৃষ্টির আড়ালে রেখে দেওয়ার প্রচেষ্টাও চলছে। আর তাই, এ সময়কালে মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়নসহ বামপন্থী, কমিউনিস্টদের ভূমিকা সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনাকে উপলব্ধিতে এনে, দেশকে মুক্তিযুদ্ধের ধারায় পরিচালিত করতে গেলে মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়নসহ এদেশের বামপন্থী, কমিউনিস্টদের অবদানের ইতিহাসকে সামনে তুলে আনার কোন বিকল্প নেই।

## মুক্তিযুদ্ধের শেকড়সন্ধান ও ছাত্র ইউনিয়নের জন্ম

ফকির বিদ্রোহ, সন্যাস বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে ভারতজুড়ে স্বরাজের জন্য নানামাত্রিক আন্দোলন-সংগ্রাম, অনুশীলন, যুগান্তরের মত সশস্ত্র গ্রুপসমূহের বিপ্লবী প্রয়াস বাংলাকে পরিণত করেছিল অগ্নিগর্ভে। শত বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে মুক্তিচেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল, তার মাঝেই বিকশিত হয়েছে বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই ভারতবর্ষে বামপন্থী ধারার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। ক্রমশই সুসংগঠিত হতে থাকে কমিউনিস্টরা, ফলশ্রুতিতে বেগবান হতে থাকে এদেশের উপনিবেশবিরোধী অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম। বাংলাতেও সেই প্রগতিশীল আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে। ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম যখন অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে; বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামে ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, ভগত সিং, রাজগুরু, আশফাকউল্লাহ, সূর্যসেন, প্রীতিলতাদের মত অসংখ্য তরুণের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত যখন মানুষকে উজ্জীবিত করছে স্বাধীনতার মন্ত্রে, তখনই ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উৎসাহে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে

দেয়া হয় ভারতবর্ষজুড়ে। নানামুখী ষড়যন্ত্র এবং উত্তাল সেই সময়ে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনাবলীকে ঘিরে সৃষ্ট গণবিভ্রান্তিকে কাজে লাগিয়ে সামনে নিয়ে আসা হয় দ্বি-জাতি তত্ত্বকে। ভারতবর্ষের জনগণের বিজয়কে খন্ডিত করা এবং ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়া উপনিবেশিক শোষণ নিশ্চিত করার ষড়যন্ত্রকে সফল করে জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্র।

সাংস্কৃতিকভাবে এ ভূ-খণ্ডের মানুষ ধারণ করে অসাম্প্রদায়িক, উদার, মানবতাবাদী চরিত্রকে। সুফিবাদ, মরমীবাদ, বাউল ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্রনাথ, লালন, বিবেকানন্দ, নজরুলের মত মনিষীরা উদার মানবতাবাদী দর্শন প্রোথিত করেছেন বাঙালির মানসপটে। সেই চরিত্রকে ধারণ করে এবং হাজার বছরের নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-সংগ্রামকে লালন করা সত্ত্বেও পাকিস্তান নামক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রকাঠামোর অংশ হওয়া বাঙালিদের মধ্যে এক নতুন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। অধিকন্তু, পাঞ্জাবি একচেটিয়া ধনিকদের নেতৃত্বে পরিচালিত পাকিস্তানী রাষ্ট্রযন্ত্রের শোষণের খড়্গ নেমে আসে পূর্ববঙ্গের মানুষের ওপর। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিকক্ষেত্রে নিদারুণ বৈষম্য, ভাষা-সংস্কৃতির উপর আগ্রাসন, রাষ্ট্রযন্ত্রের দমন-নিপীড়ণ এ অঞ্চলের মানুষকে ক্রমশ মুক্তিসংগ্রামের দীক্ষায় দীক্ষিত করে তোলে।

দেশ ভাগের অব্যবহিত পরেই উপমহাদেশের কমিউনিস্টদের কণ্ঠে সর্বপ্রথম আওয়াজ ওঠে, 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়'। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্টরাও এই স্লোগান নিয়ে মানুষের কাছে যেতে থাকেন। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কমিউনিস্টরাই সর্বপ্রথম ১৯৪৭ সালের সেই তথাকথিত স্বাধীনতাকে মিথ্যে বলে চিহ্নিত করেন। সেই মিথ্যে স্বাধীনতাকে প্রত্যাখ্যান করেই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মুক্তির মহান লক্ষ্যে ১৯৭১ সালে সংঘটিত হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। যদিও, মাত্র কয়েক বছরের মাথায়, বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবীদের দখলে চলে যাওয়ায় আমরা আজো সেই মুক্তির প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারিনি, এখনো কোটি মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে।

কমিউনিস্টদের উপর পাকিস্তান জন্মের পর থেকেই নেমে আসে ফ্যাসিস্ট আক্রমণ, নির্যাতন, জুলুম। তার মাঝেই নাচোলের রাণী কমরেড ইলা মিত্রের নেতৃত্বে তেভাগা আন্দোলন, কমরেড মণি সিংহের নেতৃত্বে টঙ্ক আন্দোলন, অজয় ভট্টাচার্য-বারীন দত্তের নেতৃত্বে নানকার বিদ্রোহ গড়ে ওঠে। শাসকশ্রেণীর হিংস্রতায় ১৯৫০ সালে এ দেশের প্রথম জেল হত্যাকাণ্ডে রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে শহীদ হন কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা। কমিউনিস্টদের সংগ্রামে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নের সাথে সাথে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, ভাষার অধিকার এবং বাঙালি জাতির অন্যান্য অধিকারের প্রসঙ্গও ক্রমশ সামনে আসতে থাকে। পূর্ব বাংলার নিপীড়িত মানুষও সচেতন

ও সংগঠিত হতে শুরু করে তাদের শ্রেণীগত ও জাতিগত অধিকার সম্পর্কে।

১৯৪৮ সাল থেকেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে মহান ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। সূচনালগ্ন থেকেই প্রগতিশীল, বামপন্থী কমিউনিস্টরা এই আন্দোলনকে সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। জিন্নাহ যখন কার্জন হলে এসে ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখন ছাত্ররা সমস্বরে 'না, না' বলে চিৎকার করে ওঠে। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বামপন্থী, কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে এসে ছাত্রদের মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তন-মননের ধারা বিকশিত হতে শুরু করে। ১৯৫২ সালের মহান ২১শে ফেব্রুয়ারীতে শহীদদের আত্মদান এ আন্দোলনকে এনে দেয় অপ্রতিরোধ্য গতি।

এ ঐতিহাসিক বাস্তবতায় এবং ৫২'র ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মাঝে যে প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনার উন্মেষ ঘটে, তার উপর ভিত্তি করে ১৯৫২ সালের ২৬শে এপ্রিল প্রতিষ্ঠা লাভ করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। ভাষা আন্দোলনের সুপরিচিত ও সামনের সারির জনপ্রিয় ও প্রধান নেতাদের বেশিরভাগই ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠায় ও তার দ্রুত প্রসারের কাজে সমবেত হল–সেসময়ের প্রেক্ষিতে তা একটি স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানী রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরে সর্বপ্রথম অসাম্প্রদায়িক ছাত্র গণসংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ছাত্র ইউনিয়ন জানিয়ে দেয়, সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানের ভিত্তিভূমিকে আঘাত করার সময় ঘনিয়ে আসছে। ছাত্রদের মাঝে অসাম্প্রদায়িক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, প্রগতিবাদী চেতনার মর্মমূলকে প্রোথিত করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করার মধ্য দিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন যেন পাকিস্তানী রাষ্ট্রকাঠামোকেই আঘাত করতে শুরু করে।

## ছাত্র আন্দোলনের বিকাশ ও মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুতি

ভাষা আন্দোলনের বিজয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রগণসংগঠন হিসেবে ছাত্র ইউনিয়নের অভ্যুদয়, এদেশের ছাত্র আন্দোলনকে প্রদান করে এক নতুন মাত্রা। মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে ছাত্রসমাজ দেশবাসীর সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক অগ্রসর অংশ হিসেবে ছাত্রসমাজকে চিহ্নিত করা হলেও, সেসময় এর ভেতর দরিদ্র কৃষকশ্রেণীর সন্তানদের সংখ্যার আনুপাতিক বৃদ্ধির কারণে ছাত্র আন্দোলনকে ক্রমশ র‍্যাডিকাল চরিত্র নিতে দেখা যায়। আমরা দেখি ছাত্র আন্দোলনই সেসময়কালের প্রগতিমুখী গণআন্দোলনে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করতে থাকে। ছাত্রসমাজ এবং গণমানুষের মধ্যে এক নিবিড়, অর্গানিক যোগাযোগ এবং আন্ত:সম্পর্ক ছাত্রসমাজকে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করার উপযোগী করে

তোলে। তাই পাকিস্তানপর্বে আমরা দেখি, এদেশের ছাত্রসমাজ যেমন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশে রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, তার পাশাপাশি সামরিক শাসন, অর্থনৈতিক শোষণ, সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধেও করেছে নিরন্তর সংগ্রাম।

প্রতিষ্ঠার প্রথম দশকে ছাত্রদের মাঝে ছাত্র ইউনিয়নকে অনেকটা এককভাবেই সাম্প্রদায়িকতা এবং দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। সেসময় অন্য কোন অসাম্প্রদায়িক ছাত্রসংগঠন ছিল না। 'মুসলিম ছাত্রলীগ' নামের সংগঠনটির সাম্প্রদায়িক চরিত্র তখনো বহাল ছিল। ছাত্র ইউনিয়নের অসাম্প্রদায়িক প্রচারনার প্রভাবে সেই সংগঠনটি ১৯৫৪ সালে তার নাম থেকে মুসলিম শব্দটি উঠিয়ে নেয়। দ্বিজাতিতত্ত্ব ও পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের বিপরীতে, পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে ২১ দফার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জনতার গণরায় প্রতিফলিত হয়- ৫৪'র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয়ে। যুক্তফ্রন্টের ঐক্য প্রক্রিয়ায় ছাত্র ইউনিয়ন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে যুক্তফ্রন্টের বিজয়কে নস্যাৎ করে। জারি করা হয় ৯২(ক) ধারা, চাপিয়ে দেয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন। নানা প্রলোভনের মুখে '৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন আদায় হয়ে গেছে' বলে বাঙালির স্বাধীকারের ইস্যুতে আওয়ামী লীগ পিছু হটে। বাঙালি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ 'জিরো প্লাস জিরো ইকুয়াল টু জিরো' তত্ত্ব হাজির করে পাকিস্তান সরকারের আমেরিকাঘেঁষা নীতিকে সমর্থন দেয়। ছাত্রলীগও ধারণ করে একই চরিত্র। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হয় প্রগতিশীল ও র‍্যাডিকাল বামপন্থী দল ন্যাপ। নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির পাশাপাশি নবগঠিত ন্যাপের সাথে ছাত্র ইউনিয়নের গভীর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেসময় বামপন্থী প্রগতিশীলরাই বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ছাত্র ইউনিয়ন তার সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনাকে ধারণ করে স্বাধীকার ইস্যুতে ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করতে থাকে। শাসকদের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে একুশে উদ্‌যাপন, রবীন্দ্রচর্চাসহ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা রাখে ছাত্র ইউনিয়ন।

পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক শাসন-শোষণ এবং সাম্রাজ্যবাদের পদলেহনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে স্তিমিত করতে শাসকগোষ্ঠী প্রয়োগ করে সামরিক একনায়কতন্ত্রের ফর্মুলা। ক্ষমতায় আসে আইয়ুব খান। নেমে আসে অত্যাচার-নিপীড়ণ-জুলুম। বামপন্থী প্রগতিশীলদের উপর আঘাত আসে সবচেয়ে বেশি। ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা শিকার হয় গ্রেফতার, নির্যাতন,

রাস্টিকেশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিস্কারের মত নিপীড়ণমূলক কর্মকাণ্ডের। তারমাঝেও নানা পন্থায় ও কৌশলে ছাত্র ইউনিয়ন তার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকে। ছাত্র ইউনিয়ন এবং সংস্কৃতি সংসদ ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১লা বৈশাখ পালন, রবীন্দ্র-নজরুলের জন্মবার্ষিকী পালন, সংকলন প্রকাশ, নাটক-কবিতা-গানের মাধ্যমে বাঙালি চেতনার মর্মমূলকে আবিষ্কার করে বাঙালিদের স্বাধীকারের দাবিকে বিকশিত করে। ১৯৫৯ সাল থেকে সকল ছাত্রসংগঠনকে সাথে নিয়ে একুশে উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নেয় ছাত্র ইউনিয়ন। শাসকশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক রবীন্দ্রবিরোধী চরিত্রকে অগ্রাহ্য করে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে প্রধান উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে ছাত্র ইউনিয়ন। ঐ বছরই ছায়ানটের জন্ম হয় এবং সংগঠনটির প্রতিষ্ঠার পেছনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে ছাত্র ইউনিয়ন।

১৯৫৯ সালে প্রণীত শরীফ কমিশনের অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক, সংকোচনের শিক্ষানীতির প্রতিবাদে ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করতে থাকে ছাত্র ইউনিয়ন। ১৯৬১ সালের শেষ দিকে ছাত্র ইউনিয়ন এবং ছাত্রলীগের এক যৌথ সভায় ছাত্র ইউনিয়নের প্রস্তাবনা অনুযায়ী আইয়ুবী শিক্ষানীতি বাতিল, অগণতান্ত্রিক সরকারের পতন, বাঙালির স্বাধীকারের দাবিগুলো নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। '৬২ সালে শিক্ষানীতি বাতিল এবং আইয়ুবের পতনের আন্দোলন ব্যাপকতর মাত্রা লাভ করে। ১৯৬২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি সামরিক আইন অগ্রাহ্য করে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের নেতৃত্বে রাজপথে জঙ্গি মিছিল বের হয়, ৭ ফেব্রুয়ারি আরেক জঙ্গি মিছিলে পোড়ানো হয়

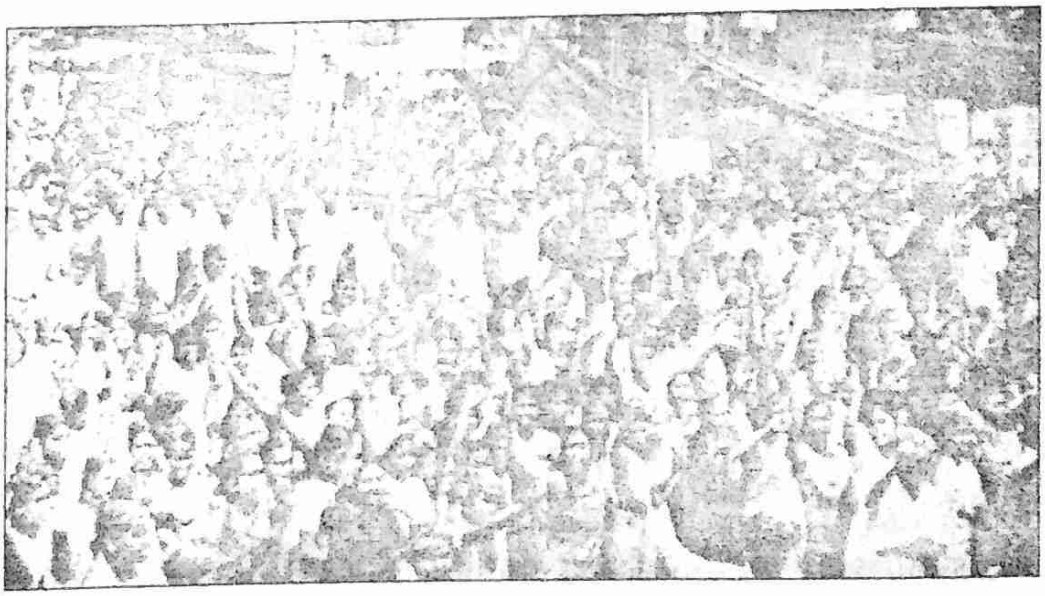

*৬২'র শিক্ষা আন্দোলন*

আইয়ুবের ছবি। এই সাহসী এবং চমকে দেয়া ছাত্রজাগরণ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ছাত্র ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল নেতৃত্বমূলক। ৬২'র দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের যৌথ নেতৃত্বে ছাত্ররা ধর্মঘট,

ক্লাসবর্জনসহ লাগাতার কর্মসূচি পালন করতে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৭ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী হরতাল ডাকে ছাত্ররা। সেদিন পুলিশের গুলিতে শহীদ হন মোস্তফা, বাবুল, ওয়াজিউল্লাহ। টঙ্গিতে ছাত্র-শ্রমিকের যৌথ মিছিলে সুন্দর আলী নামক একজন শ্রমিক নিহত হয়। গ্রেফতার হয় ছাত্র ইউনিয়নসহ অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী। আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে, প্রথমবারের মত পিছু হটে আইয়ুব জান্তা, প্রত্যাহার করে নেয় শরীফ কমিশনের রিপোর্ট। সামরিকজান্তার বিরুদ্ধে এই সফল আন্দোলন একদিকে ছাত্রদের প্রস্তুত করে সামনের দিনের কঠোর আন্দোলন-সংগ্রামের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য, অন্যদিকে ছাত্রদের এই সাহসী ভূমিকা গোটা জাতিকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে। এই আন্দোলনের অনুপ্রেরণা নিয়ে ছাত্রসমাজ সৃষ্টি করে '৬৪, '৬৬, '৬৯।

৬২'র শিক্ষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় যখন ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে গণমানুষের আন্দোলন দানা বাঁধছিল, তখন ১৯৬৪ সালে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দেয়া হয়। সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলনেও ছাত্র ইউনিয়ন পালন করে অগ্রসর ভূমিকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভেনশনে মোনায়েম খানের উপস্থিতির বিরোধীতায় গড়ে ওঠে আন্দোলনের দ্বিতীয় আরেকটি পর্ব। এসকল আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ছাত্র ইউনিয়ন সারা দেশে হয়ে ওঠে বৃহত্তম ছাত্র সংগঠন। দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন জয়লাভ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ১৯৬৫ সাল থেকেই তথাকথিত 'চীন-রাশিয়া' মতাদর্শিক বিরোধের ঢেউ এদেশের বামপন্থী মহলে এসে লাগে। জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম না সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা অগ্রাধিকার পাবে এ প্রশ্নে, ছাত্র ইউনিয়নও বিভক্ত হয়ে যায় ১৯৬৫ সালে। রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে গঠিত 'পিকিংপন্থী' গ্রুপ পরবর্তীকালে ভেঙ্গে বেশ কয়েকটি খণ্ডে পরিণত হয়। মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত মস্কোপন্থী বলে পরিচিত অপর অংশই পরবর্তীতে মূলধারার ছাত্র ইউনিয়ন হিসেবে পরিচিত হয়, যারা স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে ডাকসুসহ বিভিন্ন ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয় এবং তার উত্তরাধিকারীরা এখনও লড়াই সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিভক্তির পরপরই কমিউনিস্ট পার্টি থেকে চীনাপন্থীরা বের হয়ে যায়, বিভক্ত হয় ন্যাপও। তৎকালীন সময়ে চীনের ভারতবিরোধীতা এবং পাকিস্তানপ্রীতির কারণে পিকিংপন্থীরা গুরুতর বিভ্রান্তির শিকার হয় এবং 'পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা'র নামে 'ডোন্ট ডিস্টার্ব আইয়ুব' নীতি গ্রহণ করে। পরবর্তীতে অবশ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়া চীনাপন্থীদের অনেকেই সেই বিভ্রান্তি থেকে বের হয়ে আসে এবং ৬৯'র গণঅভ্যুত্থানসহ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। যদিও চীনাপন্থীদের কেউ কেউ ৭১'র সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধকেও 'দুই কুকুরের কামড়াকামড়ি' বলে অভিহিত করেছিল।

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের দাবি সম্বলিত ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন। এই ছয় দফার পক্ষে গণজাগরন তৈরী করতে বঙ্গবন্ধু দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচার চালান। চীনাপন্থীরা সেই ছয় দফাকে 'সিআইএ'র দলিল' হিসেবে আখ্যায়িত করে। ছাত্র ইউনিয়ন ছয় দফাকে পূর্ণাঙ্গ 'মুক্তি সনদ' না মনে করলেও 'অসম্পূর্ণ কিন্তু ন্যায্য দাবী' হিসেবে তাকে সমর্থন দেয়। ছয় দফার এবং গণমানুষের অন্যান্য দাবিতে ৭ই জুন ঐতিহাসিক হরতাল পালিত হয়। ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা সে হরতালে গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। ছয় দফার আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালি জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিব স্বাধীকারের আন্দোলনের সামনের কাতারে চলে আসে। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি হয়ে শেখ মুজিব জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে যান। যদিও স্বাধীকারের আন্দোলনকে এতদিন পর্যন্ত প্রধানত বামপন্থীরাই এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তবু সেসময় আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে যায় আওয়ামী লীগের কাছে। বামপন্থীদের চীনা শিবিরে গুরুতর বিভ্রান্তি, চীনা-রাশিয়া বিভক্তির কারণে দুর্বল হয়ে পড়া এবং মস্কোপন্থীদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে 'আওয়ামী নির্ভরতা'র ঝোঁক-ইত্যাদি কারণে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব বামপন্থীদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্র সংগীতের প্রচার নিষিদ্ধ করে। ছাত্রসমাজকে পাশে নিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনকে নিয়ে 'রবীন্দ্র স্বাধীকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ' গঠনেও ছাত্র ইউনিয়ন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ১৯৬৮ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আইয়ুব খান পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার্থে উর্দু ও বাংলার সংমিশ্রণে এক সাধারণ ভাষা সৃষ্টির ঘোষণা দেয়। ছাত্র ইউনিয়ন তার বিরুদ্ধেও গড়ে তোলে দুর্বার প্রতিরোধ। লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায়, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার, শেখ মুজিব এবং মণি সিংহের মত রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগের নেতৃত্বে দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে। মাওলানা ভাসানীও সেসময় তার আগের অবস্থান থেকে সরে এসে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন দেন। পিকিংপন্থী ছাত্র ইউনিয়নও যোগ দেয় আইয়ুববিরোধী গণসংগ্রামে। বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনকে একসাথে নিয়ে ছাত্রদের ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আন্দোলন বেগবান করার চেষ্টা করে ছাত্র ইউনিয়ন। গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনদের নিয়ে গঠিত হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ছয় দফার অসম্পূর্ণতা দূর করতে ছাত্রসমাজ ১১ দফার কর্মসূচি ঘোষণা করে, ছাত্র ইউনিয়ন-ই সেই ১১ দফা কর্মসূচির মূল রূপকার। ছয় দফার সাথে সাম্রাজ্যবাদবিরোধীতা, একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিলোপ, কৃষক-শ্রমিকের বিভিন্ন দাবি, ছাত্রসমাজের শিক্ষা বিষয়ক দাবি ইত্যাদি যুক্ত হয় এবং তা পরিণত হয় বাংলার গণমানুষের মুক্তির সনদে।

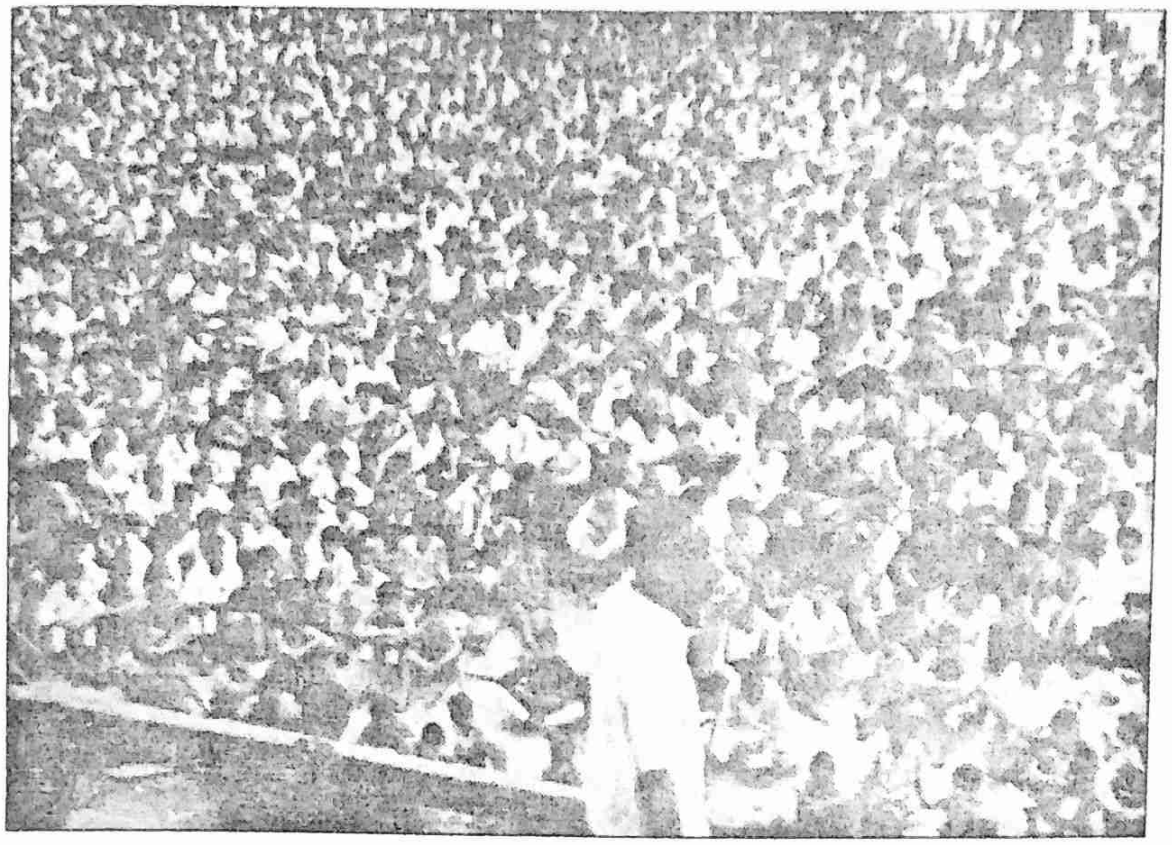

*৬৯'র গণঅভ্যুত্থানকালীন সময়ে ছাত্র ইউনিয়নের সমাবেশ*

মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা নিহিত আছে ঐ ১১ দফাতেই। ছাত্রদের নেতৃত্বে এগার দফার আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন পালন করে অগ্রণী ভূমিকা। এগারো দফার আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ছাত্র-জনতার মিছিলে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আসাদ। আসাদের রক্তমাখা শার্ট হয়ে ওঠে বাঙালির প্রাণের পতাকা। ২৪ জানুয়ারি শহীদ হন মতিউর রহমান সহ অনেকে। মিছিলে মিছিলে অগ্নিগর্ভে পরিণত হয় বাংলা। ঢাকাসহ সারা দেশে সৃষ্টি হয় ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান। গণঅভ্যুত্থানের মুখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তানীরা, ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয় আইয়ুব খান। ৬৯'র সেই মহান গণঅভ্যুত্থানের ভেতরেই নিহিত ছিল স্বাধীনতার বীজ। সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও বিভিন্ন বামপন্থী দলের পাশাপাশি ছাত্র ইউনিয়নের ভূমিকার কারণেই একটি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদভিত্তিক 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আন্দোলন না হয়ে এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তরণ ঘটেছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ধারায়। সেকারণেই, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সুবিধাবঞ্চিত বাঙালি মুসলমানদের শরিকী পাওনা আদায়ের জন্য পাকিস্তানকে দ্বিখন্ডিত করে 'লাহোর প্রস্তাব'-এর আদিরূপে ফিরিয়ে আনার সংগ্রামের বদলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য থেকে মুক্তিলাভ ও শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল।

আইয়ুব ক্ষমতা হস্তান্তর করে আরেক সেনাশাসক ইয়াহিয়া খানের কাছে। ইয়াহিয়া ক্ষমতায় এসেই সাধারণ নির্বাচন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর সেই ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৭০ সালের ২৮ ও ২৯ অক্টোবর ছাত্র ইউনিয়নের ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সফল করে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকৃত জাতীয় মুক্তির লক্ষ্য সামনে রেখে জাতীয় স্বাধিকারের শত্রু সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয় সম্মেলন থেকে। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১১ দফার সমর্থনকারী প্রকৃত ও সাচ্চা দেশপ্রেমিক জনদরদীদের নির্বাচিত করার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার কাজ চালিয়ে যায়।

বামপন্থীদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম জনগণের রাজনৈতিক চেতনাকে অগ্রসর করে, যার ইতিবাচক প্রভাব খানিকটা আওয়ামী লীগের ওপরও পড়ে। ন্যাপের অনেকগুলো প্রগতিশীল দাবিও আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে সংযুক্ত করে নেয়। এসময় ছয় দফা কর্মসূচি এবং স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির প্রতি অনড় থাকার কারণে জনগণের কাছে ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, হয়ে ওঠেন বাংলার জনগণের ঐক্যের প্রতীক। স্বাধীকারের প্রশ্নে পূর্বের বিভিন্ন সময়ে দোদুল্যমানতা প্রকাশ করা আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এ সময়ে জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়। নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ, পাকিস্তানের পার্লামেন্টে লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা। 'ভোটের বাক্সে লাথি মারো' স্লোগান দিয়ে ন্যাপ (ভাসানী) ও চীনাপন্থীদের নির্বাচন বয়কটও আওয়ামী লীগকে একক ম্যান্ডেট পেতে সহায়তা করে। ন্যাপ (মোজাফফর) মাত্র একটি আসন পেলেও, তাদের এবং ছাত্র ইউনিয়নের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রচারণা, শ্রমিক-কৃষকের অধিকারের দাবি, রুটি-রুজির প্রশ্ন, সমাজতন্ত্রের স্লোগান গণমানুষের আন্দোলনকে র‍্যাডিকালাইজড করতে ভূমিকা পালন করে। এসময় নিষিদ্ধঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টিও লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে পালন করে ঐতিহাসিক ভূমিকা। নির্বাচনের পর, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী আবারো গণতন্ত্রের বিপরীতে দাঁড়িয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। এর ফলে অনিবার্য হয়ে ওঠে সশস্ত্র সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার লড়াই। ছাত্র ইউনিয়নও প্রস্তুত হতে থাকে জনগণের পাশে থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ধরে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করার জন্য।

## স্বাধীনতার দাবি ও সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতিতে ছাত্র ইউনিয়ন

একাত্তরের শুরুতেই ছাত্র ইউনিয়ন বুঝতে পারে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নেবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। ঘোষণাপত্রে স্বাধীনতার দাবি

অন্তর্ভুক্ত করার জন্য '৭১-র ১৪ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের বিশেষ জরুরি কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করা হয়। জরুরি কাউন্সিল শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ১৪ দফা দাবি প্রণয়ন করে। এতে বলা হয়–*'পাকিস্তানের যে মূল পাঁচটি ভাষাভাষী জাতির অবস্থান, উহাদের সকলকে পাকিস্তান ফেডারেশন থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের অধিকারসহ পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকার দিতে হইবে।'* আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে অনেক গোপন সংগঠন, কিংবা প্রকাশ্য সংগঠন গোপনে স্বাধীনতার দাবি অনেক আগে থেকেই তুলেছেন, কিন্তু একটি প্রকাশ্য সংগঠনের অফিসিয়াল দলিলে স্বাধীনতার দাবি সম্ভবত এটাই প্রথম ঘটনা।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রাতিশ্লাভা শহরে আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নের (আইইউএস) দশম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের শতাধিক দেশের ছাত্র প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেসে ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জনগণের ন্যায্য দাবি ও সংগ্রামের কথা তুলে ধরা হয়। কংগ্রেসে বাংলাদেশের জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবি ও সংগ্রামের সমর্থনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ছাত্র ইউনিয়ন এই কংগ্রেসে আইইউএস-এর কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়। ফলে পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সকল দেশের ছাত্র-যুব সমাজের সমর্থন ও সাহায্য লাভ সহজ হয়।

সংগ্রামের ধারাবাহিকতায়, ২২ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত ছাত্র ইউনিয়নের সমাবেশে ঘোষণা করা হয়, *'তেসরা মার্চ সংসদ না বসলে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে।'* ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র ইউনিয়ন আয়োজিত এক সমাবেশে বলা হয়, *'পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের সভা অবশ্যই বসতে হবে এবং গণতান্ত্রিক নিয়ম মতো কোরাম হলেই তাকে আইনসিদ্ধ বলে ঘোষণা করতে হবে। অন্যথায় সংকটজনক পরিস্থিতির জন্য গণতন্ত্রবিরোধী পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীই দায়ী থাকবে।'* সমাবেশে আরো বলা হয়, *'জনগণের ভোটের রায় বাস্তবায়নের পথে কোনো প্রকার ষড়যন্ত্রই এদেশের ছাত্রসমাজ বরদাস্ত করবে না।'*

১৯৭১ সালের ১ মার্চ সংসদের অধিবেশন বাতিল করা হলে, দেশের মানুষ স্বত:স্ফুর্তভাবে রাস্তায় নেমে পড়ে। বায়তুল মোকাররম মসজিদের কাছে ছাত্র ইউনিয়নের একটি বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে মিছিল নিয়ে নেতা-কর্মীরা শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। গুলিস্তান কামানের ওপর দাঁড়িয়ে এক স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে ছাত্র ইউনিয়ন নেতারা বলেন, *'বাঙালি গণতন্ত্র চেয়েছিল কিন্তু পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী তা দেয়নি, বাঙালিরা এবার তাদের দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবে।'* ওই দিন হোটেল পূর্বাণীতে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে গঠিত পূর্বের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদকে সক্রিয় করার প্রস্তাব দেয় ছাত্র ইউনিয়ন। কিন্তু সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে ছাত্রলীগ এ প্রস্তাব গ্রহণ করেনি।

২ মার্চ ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি), জাতীয় শ্রমিক লীগ, কৃষক সমিতি প্রভৃতি সংগঠনের ডাকে কোন প্রচারণা ছাড়াই সফল হরতাল পালিত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট জেলা ছাত্র ইউনিয়ন সকল

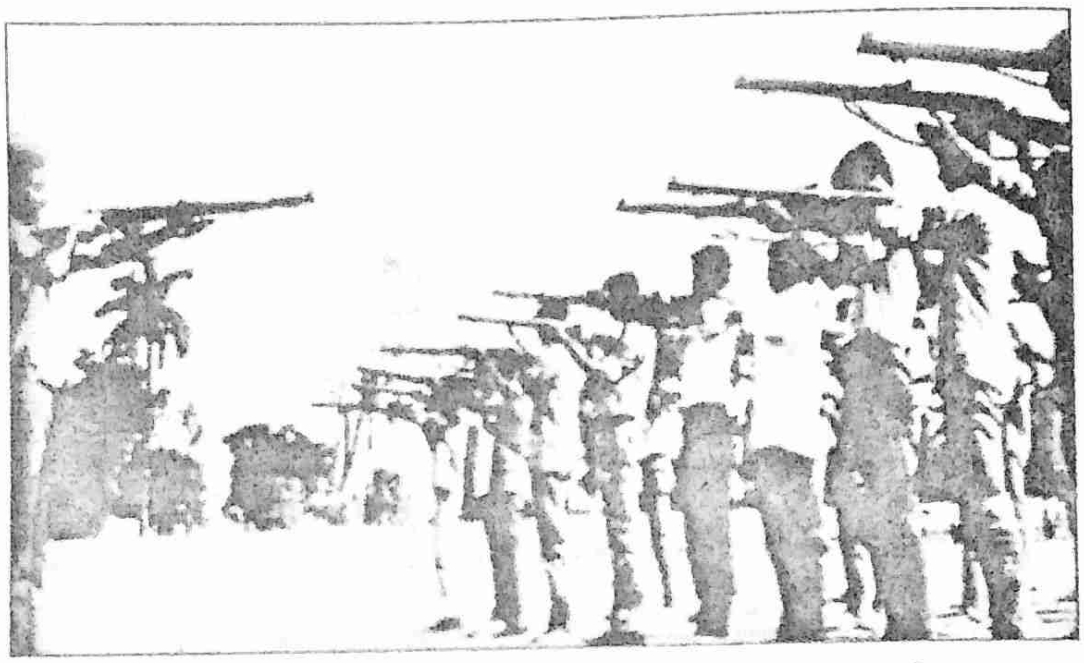

*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে চলছে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশিক্ষণ*

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করে। পল্টন ময়দানে ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ যুক্তফ্রন্ট গঠন করে পাড়া-মহল্লায় সংগ্রাম কমিটি গঠনের কথা বলেন। সাম্রাজ্যবাদ ও শোষকগোষ্ঠী সম্পর্কেও সচেতন থাকা এবং তাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম পরিচালনার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, *'অন্যথায় শোষণ বন্ধ হবে না। আবার ঠকিতে হইবে।'* ৪ তারিখে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্র ইউনিয়নের সমাবেশ থেকে ইয়াহিয়া প্রস্তাবিত নেতৃসম্মেলন প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়, এ ধরণের সম্মেলন হতে দেয়া হবে না। এ সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে থাকে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, সায়েন্স এ্যানেক্স ভবনের ক্যান্টিন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠ পরিণত হয় ছাত্র ইউনিয়নের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করে মুক্তিসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে থাকে ছাত্র ইউনিয়ন। মার্চের প্রথম দিন থেকেই, প্রতিদিন বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ছাত্র-গণ সমাবেশের আয়োজন করে

চলমান ঘটনাবলী ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে ব্রিফিং করা হতো। এছাড়া পল্টন ময়দানে বড় জনসভা করেও জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় বার্তা তুলে দেয়া হতে থাকে।

৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পরে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি কাজ আরো জোরদার করা হয়। শোষণমুক্ত স্বাধীন পূর্ব-বাংলা কায়েমের জন্য সম্ভাব্য দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করে ছাত্র ইউনিয়ন। সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার চিন্তা থেকে ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠনের কর্মী ও সচেতন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তালিকাভুক্ত করা শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে প্রতিদিন সকাল থেকে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা শুরু করে কুচকাওয়াজ, সামরিক প্রশিক্ষণ। ডামি রাইফেল দিয়ে অস্ত্র চালনার পদ্ধতি শেখানো হয়। সংগঠনের নারী কর্মীরাও এ প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রয়াত বিপ্লবী ও শহীদদের নামে আলাদা আলাদা ব্রিগেড গঠন করা হয়। এসব ব্রিগেডকে রাজনৈতিক দায়িত্ব দেয়ার পাশাপাশি সামরিক কুচকাওয়াজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতে থাকে। ২৫ মার্চ পর্যন্ত এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। জেলায় জেলায়ও একই কায়দায় ট্রেনিং শুরু হয়ে যায়। এছাড়া

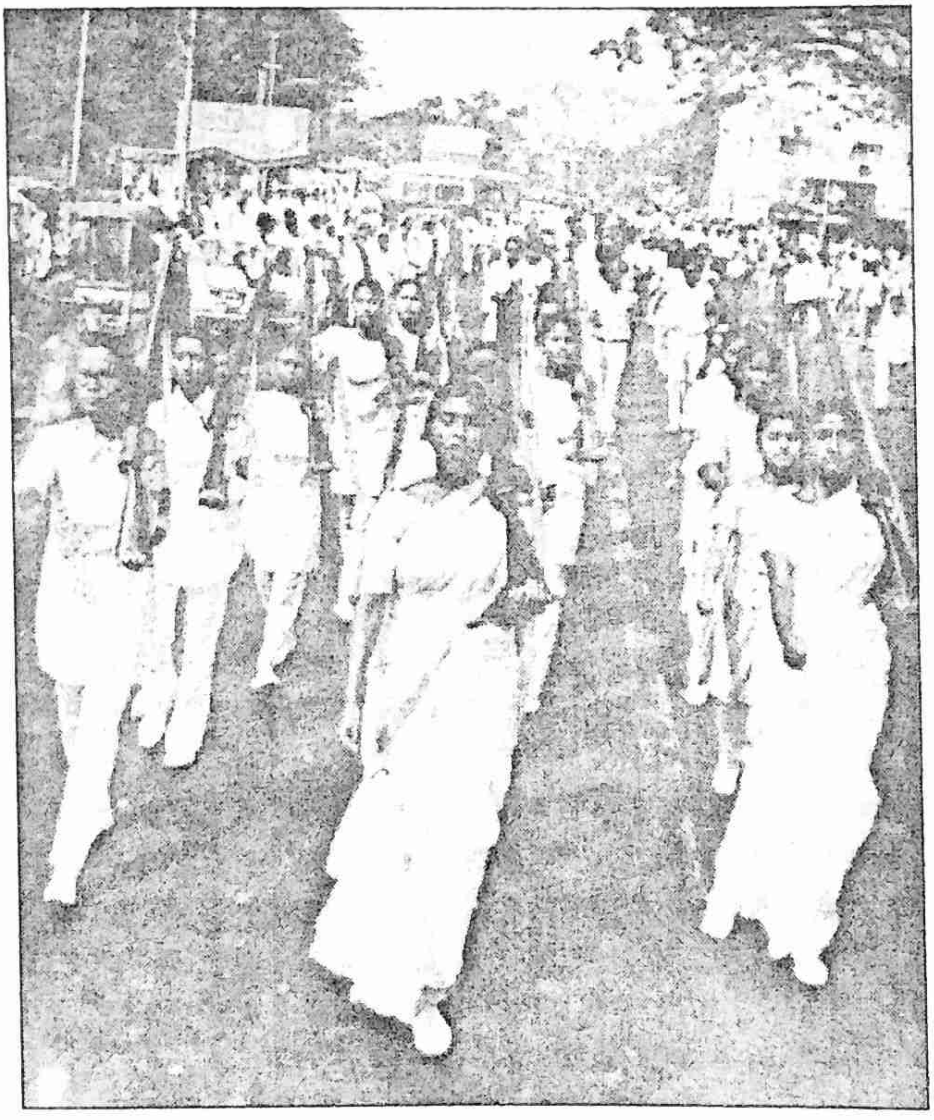

*মার্চ '৭১*

*ঢাকার রাজপথে ছাত্র ইউনিয়ন ব্রিগেডের রাইফেল কাঁধে কুচকাওয়াজ*

ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে ডামি রাইফেল নিয়ে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি, সত্যিকারের বন্দুক চালনার প্রশিক্ষণও শুরু হয়। সংগঠনের উদ্যোগে 'বোমা স্কোয়াড' গঠন করা হয়। ল্যাবরেটরি থেকে কেমিক্যাল চুরি করে এনে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা বিস্ফোরক তৈরির কাজ শুরু করে। প্রতিদিন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের মাইক থেকে 'ককটেল' তৈরি ও ব্যবহারের ওপর গণপ্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হতে থাকে।

ইয়াহিয়া শাহীর সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার প্রস্তুতি হিসেবে ছাত্র ইউনিয়ন পাড়ায় পাড়ায় গণকমিটি গঠনের আহ্বান জানায় এবং গণকমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। জনগণকে সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করার জন্য ১২ মার্চ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পথসভা ও পথসভা শেষে মিছিল বের করা হয়। ১৩ মার্চ বায়তুল মোকাররম মসজিদের গেট থেকে মশাল মিছিল বের করা হয়। ১৪ মার্চ বায়তুল মোকাররম মসজিদের গেটে অনুষ্ঠিত জনসভায় সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়, *'শাসকগোষ্ঠী তার মরণ কামড় দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।'*

ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে জেলা, থানা, প্রাথমিক শাখাসমূহকে সর্বাত্মক রাজনৈতিক প্রচার চালানো, জনগণের মধ্যে সংগ্রাম কমিটি ও গণবাহিনী গঠন করা, গ্রামে কৃষকদের মধ্যে আন্দোলন ছড়িয়ে দেয়া, বৃহত্তর দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য 'যার যা আছে তাই নিয়ে' প্রস্তুতি গ্রহণ করা, জঙ্গী কর্মী বাহিনীর সমন্বয়ে নিয়মিত প্যারেড অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেয়া হয়। ১৬ মার্চ ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের মধ্যকার বৈঠকের প্রেক্ষিতে ছাত্র ইউনিয়ন কমরেড মণি সিংহসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও সামরিক আইনে দায়েরকৃত সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানায়। ১৯ মার্চ ছাত্র ইউনিয়ন শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা কায়েমের সংগ্রাম দুর্বার করে তোলার জন্য একটি প্রচারপত্র বিলি করে। এতে বলা হয়,

*'...আমরা জনগণের এই মহান বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে সঠিক নীতিতে অগ্রসর করিয়া লইয়া এমন একটি 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা' রাষ্ট্র গঠনের আহ্বান জানাইতেছি, যে রাষ্ট্রে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি জনগণের প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ উন্মুক্ত হইবে।'*

*'...তথাকথিত দেশপ্রেমিকরা এই সংগ্রামকে ভুল পথে ঠেলিয়া দেওয়ারও প্রচেষ্টা করিতেছে। ইহারা স্বাধীন পূর্ব বাংলায় তাহাদের শ্রেণীস্বার্থ হাসিলের লক্ষ্য হইতে বাঙালি জনতাকে বুঝাইতে চায় যে, এই সংগ্রামে পূর্ব বাংলার অবাঙালি মেহনতী জনগণও আমাদের দুশমন। প্রকৃতপক্ষে যে শাসকগোষ্ঠী আমাদের সংগ্রামকে দমন করিতে চাহিতেছে, ইহারা পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণকেও শোষণ করিতেছে। তাই এই সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে নয়, পূর্ব বাংলার অবাঙালিদের বিরুদ্ধেও নয়। এই সংগ্রাম পরিচালিত করিতে হইবে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ও ইহাদের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে।'*

২০ মার্চ ঢাকায় অবিস্মরণীয় একটি ঘটনা ঘটে। ছাত্র ইউনিয়নের ট্রেনিংপ্রাপ্ত গণবাহিনীর শত শত সদস্য রাজপথে ডামি রাইফেল কাঁধে নিয়ে মার্চ করে। এ দৃশ্য ছিল ঢাকার মানুষের কাছে নতুন। জনতা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং করতালির মাধ্যমে অভিনন্দন জানায়। এই ঘটনা সমগ্র শহরে এক বিরাট সাড়া জাগায়। এ সময় ১২টি প্লাটুনে বিভক্ত হয়ে গণবাহিনীর সদস্যরা প্যারেড, শরীরচর্চা ও রাইফেল কলাকৌশল প্রদর্শন করে। প্রিয় মাতৃভূমি পূর্ব বাংলাকে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির শোষণ থেকে মুক্ত করে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিক-কৃষক জনতার মুক্তির পথ উন্মুক্ত করার শপথ গ্রহণ করা হয়।

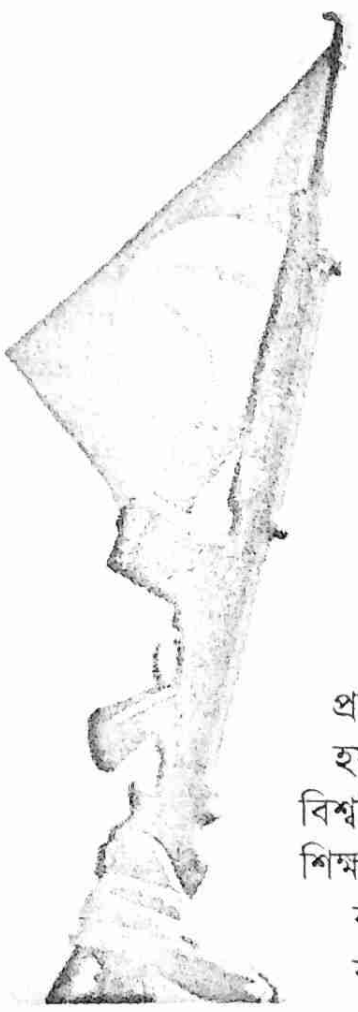

২৫ মার্চ ভোর বেলা সাবেক ছাত্র ইউনিয়ন নেতা ও তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ রাতের সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক করে একটি 'চিরকুট' ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্বের কাছে পাঠান। 'চিরকুট' পেয়ে ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কতগুলো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়। জনগণকে সজাগ করার জন্য ঢাকা শহরের সর্বত্র ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা ছড়িয়ে পড়েন। মাইকযোগে সতর্ক-বার্তা প্রচার করা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা পথসভা ও খণ্ডমিছিল নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। শহীদ মিনারের সমাবেশে জনগণকে সতর্ক থাকতে এবং প্রতিরোধের ব্যূহ রচনা করতে আহবান জানানো হয়। হলে- হোস্টেলে না থাকার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়। ২৫ মার্চের কালো রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজিম, সুশীলসহ কয়েকজন ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও, সকল ছাত্রকে হল থেকে সরাতে না পেরে হলেই থেকে যান এবং লক্ষ লক্ষ শহীদের সাথে নিজেদের একাত্ম করে দেন। সাধারণ ছাত্রদের সুখ-দুঃখে সাথে থাকতে হবে, এই চেতনাবোধই এদেরকে হল থেকে সরে গিয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আস্তানায় যেতে দেয়নি।

এভাবেই ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিরোধের পথে অগ্রসর হয়, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার দৃপ্ত শপথে সশস্ত্র যুদ্ধে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে।

# RESOLVE TO FIGHT TILL VICTORY

Statement issued on behalf of the central committee of the East Pakistan Students' Union (Student's Union of Bangla Desh), by Nurul Islam, president, and Mujahidul Islam Salim, general sectetary, on 20 April 1971

On behalf of the fighting students' community of Bangladesh the central committee of Students' Union expresses its rejoicing at the announcement of the formation of a new independent state of Bangla Desh named the People's Republic of Bangla Desh with Sheikh Mujibar Rahaman as its head and Tajuddin as the executive head If the government. We heartily welcome this happy announcement. We call upon the student community of Bangla Desh to celebrate this occasion.

On behalf of the student community of Bangla Desh, we firmly declare that this new government formed by Awami League leadership is the only legally constituted government of Bangla Desh. This government is strongly backed by the legal sanction given to them by the people during the last general election. We declare our unequivocal support to this government. We call upon the students and people of Bangla Desh to rally behind this government and remain firm and united in support of this government.

We appeal to the forces of democracy, peace, freedom and progress all over the world to come forward in support of this government of Bangla Desh. We appeal to all democratic and progressive governments of the world to recognize this newly-formed government of Bangla Desh and to render all possible help in repulsing the brutal aggression of the reactionary fascist ruling military junta of Pakistan.

We appeal to the freedom-loving and progressive students and youth of the whole world to support our struggle for achieving self-determination and independence of Bangladesh and to render all possible help to us. We appeal to all students, youth, friends and comrades of the world to mobilise mass opinion in condemnation of the barbaric and fascist aggression of the Pakistan military junta who are demolishing all education institutions and killing students by cannon shelling, bombing, machine gunning etc.

We pay homage to the brave people of Bangla Desh who have fallen in the battle against the fascist aggression of Pakistan army led by Yahya Khan. We again firmly declare that our students' community is determined to continue the struggle until the defeat of the fascist army of Pakistan government and to materials the cherished aims of the martyrs-the freedom of Bangla Desh.

We congratulate the people of Bangla Desh for their firm determination and their brave struggle aggressors. We call upon all sections of the people of Bangla Desh, especially the student community and Mukti Fouj, to plunge into the patriotic struggle in defense of the freedom of their motherland and against the barbaric and fascist Pakistan army.

We congratulate the governments and peoples of USSR, India and other countries for their support to the cause of the people of Bangladesh in condemning the barbarism of Pakistan army.

We call upon the newly-formed government of Bangla Desh and the Awami League leadership to take initiative for uniting and mobilizing all the fighting forces, political parties and other fighting student and mass organizations and to form a broad based and strong national united liberation front against the aggressors.

We appeal to the fighting student organizations of Bangla Desh and the student community and youth at large to continue united the liberation struggle with new vigour and force.

We appeal to the students, youth and democratic and progressive people of Baluchistan, Pakhtoonistan, Sindh and Punjab to stand firmly in favor of the liberation struggle of Bangla Desh and against the barbaric aggression of the reactionary Pakistan government and continue their struggle for democracy and national liberation against the common enemy.

We appeal to the fighting students, liberation army and people to carry on their struggle. We firmly believe that the atrocities of the aggressors will be repulsed and aggression will be crushed to dust. The liberation struggle of Bangla Desh will be victorious.

Long Live Democratic People's Republic of Bangla Desh!

তখনকার বানানরীতি অবিকৃত রেখে, Bangladesh শব্দকে Bangla Desh আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

## যুদ্ধের ময়দানে ছাত্র ইউনিয়ন

২৫ মার্চের কালো রাতের পর ছাত্র ইউনিয়ন যুদ্ধ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অংশ নেয়। ছাত্র ইউনিয়ন, জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনে ছাত্রলীগকে সাথে নিয়ে একটি যৌথ গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ছাত্রলীগ এ প্রস্তাবে সম্মতি দেয়নি। সেসময় ছাত্রলীগের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ছাত্র ইউনিয়নের ঐক্য প্রচেষ্টা সফল হয়নি। অনেক পরে এই ঐক্য প্রচেষ্টার এক পর্যায়ে নভেম্বর মাসে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ নেতৃত্বের একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশিত হয়। যদিও ছাত্রলীগের একটা অংশ এই বিবৃতিরও বিরোধীতা করে। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগের যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়–

*'There is nothing in the world more glorious than sacrificing our lives in the struggle for liberating our motherland.'*

২৫ মার্চের পর যখন হাজার হাজার মানুষ দেশ ছেড়ে সন্ত্রস্ত্রভাবে পালিয়ে যাচ্ছে, তখন ছাত্র ইউনিয়নের নির্ভীক কর্মীরা মৃত্যুর ভয় উপেক্ষা করে দেশপ্রেমের মহান কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকেছেন। ছাত্র ইউনিয়ন দেশব্যাপী ছাত্র, তরুণ, যুবকদের সংগঠিত করে সর্বাত্মক সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। প্রথম থেকেই ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা দেশের ভেতরে যেখানে যতটা সম্ভব সেই মত প্রতিরোধের চেষ্টায় নিয়োজিত হয়। যেখানেই সম্ভব তারা সেখানেই পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সদস্যদের সহায়তায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। নরসিংদীর রায়পুরা, শিবপুর, চট্টগ্রাম, বগুড়া, পাবনা, বরগুনা, পিরোজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাথমিক প্রতিরোধের অন্যতম শক্তি ছিল ছাত্র ইউনিয়নসহ অন্যান্য বামপন্থীরা।

আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের জন্য ছাত্র ইউনিয়ন বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে প্রেস কনফারেন্স করে বিশ্বের সামনে সকল ঘটনাবলী তুলে ধরা হয়। ২০ মে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন ছাত্র-যুব সংগঠনের কাছে চিঠি পাঠানো হয়। এতে বিশ্বের সকল ছাত্র যুব সংগঠনের প্রতি স্বীকৃতি, অস্ত্র, অর্থ, খাদ্য, ওষুধ ইত্যাদি প্রদান করার আহ্বান জানানো হয়। এরই প্রেক্ষিতে ছাত্র ইউনিয়নের কাছে প্রেরিত চিঠিতে বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন (আই.ইউ.এস), সোভিয়েত যুব কমিটিসহ বিশ্বের বহু সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ও সংহতি প্রকাশ করে। দুনিয়ার নানা প্রগতিশীল ছাত্র-যুব সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর পোস্টার ও প্রচারপত্র প্রকাশিত হতে থাকে।

১৭ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করা হলে, ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ

থেকে নবগঠিত সরকারকে স্বাগত জানিয়ে এক ঐতিহাসিক বিবৃতি প্রচার করা হয়। বিবৃতিতে ছাত্র ও যুব সমাজকে সকল শক্তি নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানো হয়। এপ্রিল মাস থেকেই বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগত ছাত্র-যুবকদের ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয়। কিন্তু সেটা ছিল বিক্ষিপ্তভাবে। পরবর্তীতে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হয় আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ। এর আগ পর্যন্ত প্রশিক্ষণে ছাত্র ইউনিয়ন তথা বামপন্থী কর্মীদের অংশগ্রহণ সহজ ছিলো না। মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুটিং ও প্রশিক্ষণের জন্যে সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে যুব শিবির ও অভ্যর্থনা শিবির স্থাপন করা হয়। এসবের 'বোর্ড অব কন্ট্রোল' ছিলেন খন্দকার মোশতাকের ঘনিষ্ঠ অনুচর মাহবুব আলী চাষী। এই সব শিবিরে বামপন্থী ছাত্র যুবকদের প্রশিক্ষণের সুযোগ যেন না ঘটে, সে লক্ষ্যে 'স্ক্রীনিং'-এর সময় বামপন্থী ছাত্র-তরুণরা 'বহির্দেশীয় আনুগত্য' থেকে মুক্ত নয় বলে তুলে ধরা হয়। এর প্রধান শিকার হয় ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা। আওয়ামী পরিষদ দ্বারা শনাক্তকৃত হওয়ার পরই কেবল এইসব শিবিরে যুক্ত হওয়ার সুযোগ ঘটতো। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের একটা অংশ বামপন্থী কর্মীদের সশস্ত্র ট্রেনিং নেয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি তোলে এবং বাধা দেয়। এতদস্বত্ত্বেও অসংখ্য ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী তাদের সাংগঠনিক পরিচয় গোপন রেখে বিভিন্ন সেক্টরের এফএফ বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীতে ঢুকতে সক্ষম হয়। তারা অসীম সাহস ও বীরত্ব দেখিয়ে তাদের অমোঘ দেশপ্রেমের প্রমাণ রাখে ও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার মর্যাদা লাভ করে। এক পর্যায়ে যুদ্ধ দীর্ঘমেয়াদী হয়ে পড়লে বামপন্থীদের মোকাবেলার উদ্দেশ্যে 'মুজিব বাহিনী' গঠন করা হয়। তারা তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বেরও বিরোধীতা করতে থাকে। অস্থায়ী সরকার 'মুজিব বাহিনী'কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না। উল্টো 'মুজিব বাহিনী' অস্থায়ী সরকারের বিপরীতে স্বতন্ত্র নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। ভারতের শাসকগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল। ঐক্যবদ্ধ মুক্তিসংগ্রামের প্রশ্নে 'মুজিব বাহিনী' বাতিল করা প্রয়োজন হয়ে পড়লেও, সেটা করা সম্ভব হয়নি।

ছাত্র ইউনিয়নের জন্যও স্ব-উদ্যোগে যুদ্ধ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অংশ নেয়ার সুযোগ তৈরী হয়। ফলশ্রুতিতে মে মাসেই ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়নের বিশেষ গেরিলা বাহিনী গঠিত হয়। ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্ব তাজউদ্দিন আহমেদ ও প্রধান সেনাপতি ওসমানীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। এক পর্যায়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডিপি ধরের সাথেও ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের বৈঠক হয়। তাজউদ্দিন আহমেদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা মঈদুল হাসান এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ডিপি ধর এবং তাজউদ্দিন আহমেদ প্রশিক্ষণে বামপন্থীদের যুক্ত করার ক্ষেত্রে আগ্রহী ছিলেন এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

অবস্থার পরিবর্তন ঘটে ভারতের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই)'র হস্তক্ষেপে। মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়নের ট্রেনিং এর ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেন। 'মুজিব বাহিনী'কে বাতিল করা সম্ভব না হলেও, বামপন্থী যুবকদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে একটা ভারসাম্যমূলক অবস্থা তৈরি করা সম্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে ডিপি ধরের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

*'Objection to recruit left elements was lifted mainly to offset the influence of Mojib Bahini.'*

বামপন্থীরা ট্রেনিং লাভে সমর্থ হওয়ায়, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম'-এর ধারায় অগ্রসর করা সহজতর হয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম' হিসেবে স্বীকৃতি পায়। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সমর্থন লাভের বিষয়টি নিশ্চিত হয়। আসামের তেজপুরের নিকটবর্তী সালোনবাড়ি নামক স্থানে একটি বিশেষ ক্যাম্প স্থাপন করে মে মাসের ২৮ তারিখে ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়নের 'বিশেষ গেরিলা বাহিনী'র প্রথম ব্যাচের ২০০ জনের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদকও সেই দলে ছিলেন। চার সপ্তাহ পরে এদের মধ্যে ৫০ জনকে বিশেষ ট্রেনিং-এর জন্য নেফা এলাকার ভালুকপং-এর একটি দুর্গম এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। ১১ জুলাই শেষ হয় প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণে ছাত্র ইউনিয়নসহ বামপন্থীদের উচ্চমান দেখে পরবর্তী ব্যাচগুলোতে গেরিলার সংখ্যা ডবল করে ৪০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পর্যায়ক্রমে ব্যাচের পর ব্যাচ প্রশিক্ষণ চলতে থাকে।

ট্রেনিং শেষে বিশেষ গেরিলা বাহিনী ত্রিপুরার একটি নির্জন স্থানে তাদের বেজক্যাম্প স্থাপন করে। এখান থেকেই অপারেশন প্লানিং কমিটির পরিচালনায় দেশের ভেতর গেরিলাদের 'ইনডাকশনে'র কার্যক্রম ও গেরিলা অপারেশনসহ সামরিক তৎপরতা চালানো হয়। অস্ত্রশস্ত্রের পর্যাপ্ত সরবরাহ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা সম্পন্ন হবার পর সেপ্টেম্বরের শুরুতে ইনডাকশন শুরু হয়। প্রথম ব্যাচের গেরিলাদের ইনডাকশন শেষ হবার পর পরবর্তী ব্যাচের যোদ্ধারা একে একে দেশের ভেতরে ঢুকে অবস্থান নিতে থাকে। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ছোট ছোট অপারেশন শুরু হয়ে যায়। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে অপারেশনের সংখ্যা বাড়তে থাকে। নভেম্বরের মাঝামাঝি পরিষ্কার হয়ে ওঠে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। এ অবস্থায় অপারেশনের মাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য দেশের অভ্যন্তরের বিভিন্ন গ্রুপকে নির্দেশ দেয়া হয়। রায়পুরা, মনোহরদী, শিবপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বৃহত্তর বরিশাল প্রভৃতি এলাকায় একের পর এক সফল অ্যাকশন পরিচালিত হয়। গেরিলা

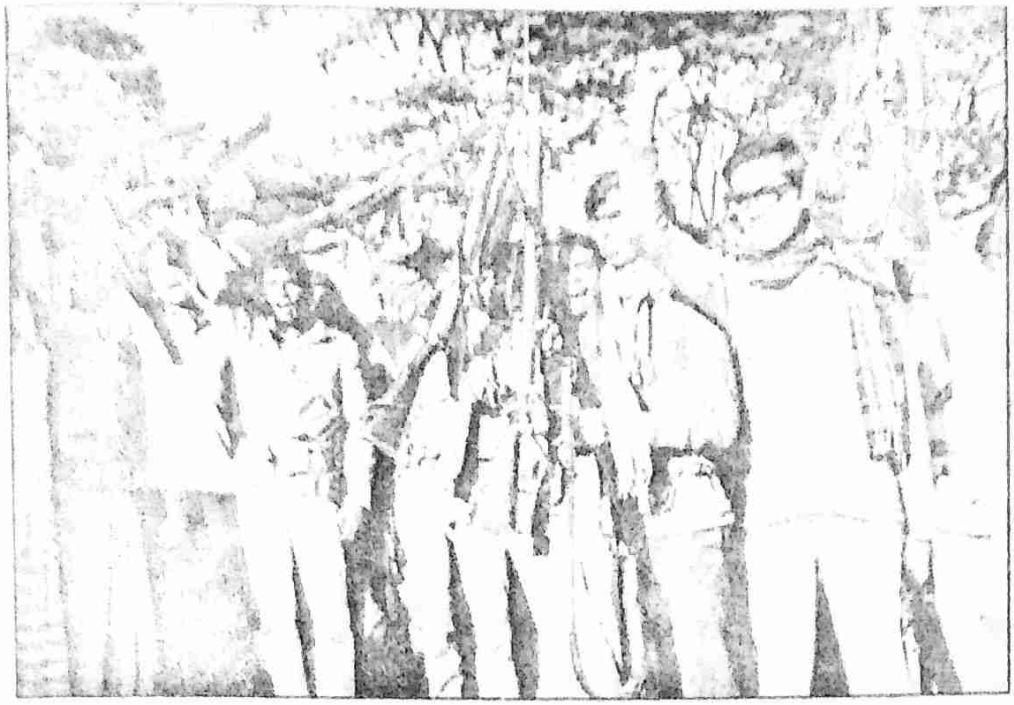

*ছাত্র ইউনিয়নের গেরিলা বাহিনীর সদস্যরা*

বাহিনীর অ্যাকশনগুলোতে ছাত্র ইউনিয়নের যোদ্ধারা পালন করেন বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা।

একাত্তরের ১১ নভেম্বর আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সুমহান গৌরবগাঁথায় যুক্ত হয়েছিল একটি উজ্জ্বল রত্নকণিকা। সেদিন কুমিল্লার সীমান্তবর্তী বেতিয়ারায় পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে গেরিলা বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। কয়েক ঘন্টা ধরে চলা অনেকটাই 'হ্যান্ড টু হ্যান্ড' যুদ্ধে শহীন হন ছাত্র ইউনিয়ন নেতা নিজামউদ্দিন আজাদ, সিরাজুল মুনির, শহীদুল্লাহ সাউদসহ ৯ জন গেরিলা যোদ্ধা। সেদিন শত্রুবাহিনীর অকস্মাৎ অ্যামবুশ এবং আক্রমণের মুখেও ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়নের গেরিলা বাহিনী যে সাহসের পরিচয় দিয়ে যুদ্ধ করেছে, তা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যোগ করেছে আরেকটি অনুপ্রেরণাদায়ী অধ্যায়। এখনো প্রতিবছর ১১ নভেম্বর ছাত্র ইউনিয়ন, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ, খেলাঘর প্রভৃতি সংগঠন এবং এলাকাবাসী সেই গেরিলা যোদ্ধাদের সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং সেই বীর যোদ্ধাদের স্মৃতিচারণ করে।

ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল অপারেশন প্লানিং কমিটি। পূর্বাঞ্চলীয় জোন এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় জোন- এই দুই কেন্দ্র ধরে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছিল। নভেম্বরের শেষ দিকে যখন বোঝা যায় যে সহসাই চূড়ান্ত পর্যায়ের কনভেনশনাল যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে, তখন সব গেরিলা ইউনিটকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, পাকিস্তানী সেনারা যাতে ক্যাম্পের বাইরে মুভ না করতে পারে সে ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে। গেরিলা কায়দা অনুসরণের পরিবর্তে তাদের কনভেনশনাল যুদ্ধের কলাকৌশল

অবলম্বন করার পরামর্শ দেয়া হয়। আরো পরে যখন সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়, সব ইউনিটকে তখন যতো দ্রুত সম্ভব ঢাকার কাছাকাছি পৌঁছে ঢাকাকে ঘেরাও করতে বলা হয়। ট্রেনিংপ্রাপ্ত যে কয়েকশ গেরিলার তখনো ইনডাকশন হয়নি, তাদের সবাইকে একসাথে নিয়ে অতি দ্রুত মার্চ করে ঢাকাকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে রাখার উদ্যোগ নিতে বলা হয়। একটি বড় গেরিলা দল ঢাকার দক্ষিণাঞ্চলে সাময়িক ঘাঁটি স্থাপন করে। ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে বিশেষ গেরিলা বাহিনীর শত শত যোদ্ধা দোহার, নবাবগঞ্জ, শ্রীনগর, গজারিয়া ইত্যাদি এলাকায় জমায়েত হয়ে ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে। ১৪ ডিসেম্বর অস্ত্রসজ্জিত ও সমর সম্ভারসহ গেরিলা দলের ঢাকায় প্রবেশের অভিযান শুরু হয়। অব্যাহত চাপের মুখে পর্যুদস্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ভোর হতেই রাজধানীর উপকণ্ঠে থাকা গেরিলা দল মার্চ করে সকালের মধ্যে চলে আসে ঢাকার কেন্দ্রস্থলে। বিধ্বস্ত শহীদ মিনারে রাইফেল উঁচিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের যে দলটির শপথ নেবার ছবি দেশ-বিদেশে বহুল প্রচারিত, তা ছিল ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়নের গেরিলা বাহিনীর দল, শত্রুমুক্ত ঢাকা শহরে যারা প্রথম প্রবেশ করেছিল। ছাত্র ইউনিয়নের বীর যোদ্ধারা সেদিন মুক্ত ঢাকায় 'মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজ' গড়ার শপথ নিয়েছিলেন।

১৯৭২ সালে ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলনের রিপোর্টে বলা হয়, '*২৫ মার্চ সশস্ত্র স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হলে জনগণ ও ছাত্র সমাজের বিভিন্ন অংশের পাশাপাশি আমাদের সংগঠনের সদস্য-সদস্যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেয়। প্রথম দিকে আমাদের বিপুল সংখ্যক কর্মী মুক্তিবাহিনীতে ট্রেনিং নেয় এবং পাক বাহিনীর মোকাবেলায় এগিয়ে যায়। আমরা প্রথম থেকেই ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি দলের সাথে ঐক্যবদ্ধ বাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা করি। কিন্তু এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি মিলিত ভাবে গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলি। পরবর্তীতে আমরা সংগঠনের নিজস্ব নামেও বিশেষ গেরিলা বাহিনী ট্রেনিং ও গেরিলাযুদ্ধ সংগঠিত করি।*' রিপোর্টে আরো বলা হয়, '*আমাদের ঐক্যের প্রচেষ্টা পুরপুরি সফল না হলেও জনগণের মধ্যে এবং বিভিন্ন মুক্তি সংগ্রামীদের মধ্যে ঐক্য বজায় ছিল। সহযোগী ছাত্রসংগঠনের কিছু কিছু সদস্য বিভেদাত্মক কার্যকলাপ চালায়। আমরা এর নিন্দা করি।*' গেরিলা বাহিনীতে ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়, '*আমাদের নিজস্ব গেরিলা বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ছয় হাজার। এবং মুক্তিফৌজ ও গেরিলা বাহিনীতে আমাদের সংগঠনের মোট শক্তি ছিল প্রায় পনের হাজার।*' এখানে উল্লেখ্য যে, নানা প্রতিকূলতা স্বত্ত্বেও মুক্তিবাহিনী, এফ এফ বাহিনীতে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীসহ অসংখ্য বামপন্থী তরুণ যোগ দেয়। মেরিন গেরিলা বাহিনীর বিভিন্ন অপারেশনে বামপন্থীরা অসামান্য কৃতিত্ব দেখান। ঢাকার ঐতিহাসিক ক্র্যাক প্লাটুনের সাহসী

অপারেশনগুলোতে বামপন্থী তরুণেরা তাদের সাহস, দেশপ্রেম, দক্ষতা, আত্মত্যাগের প্রমাণ রেখেছে। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন আঞ্চলিক বাহিনীতেও ছাত্র ইউনিয়নসহ বামপন্থী চিন্তার তরুণদের ভূমিকা ছিল অসামান্য।

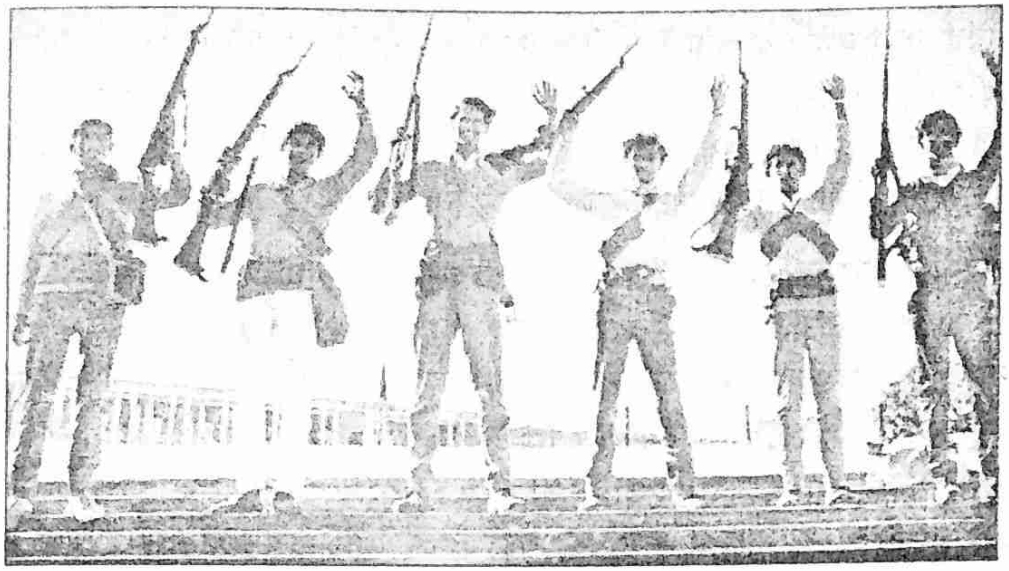

*মুক্ত স্বদেশে বিধ্বস্ত শহীদ মিনারে ছাত্র ইউনিয়নের গেরিলা বাহিনীর সদস্যরা*

## ইতিহাসের দায় : অসমাপ্ত লড়াইয়ের ডাক

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরী এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ছাত্রসমাজ এবং জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতে গিয়ে ছাত্র ইউনিয়নকে যেমন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী শক্তির দোদুল্যমানতা, আপসকামীতা এবং সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে, পাশাপাশি উগ্র ও সংকীর্ণ বাম বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতিকেও মোকাবেলা করতে হয়েছে। ছাত্র ইউনিয়নই যথাসম্ভব ও তুলনামূলক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। শুধু তত্ত্ব, প্রচার ও রাজনৈতিক কাজই নয়, ছাত্র ইউনিয়নের শীর্ষ পর্যায়সহ সাধারণ স্তরের সচেতন কর্মীরা মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে অস্ত্র হাতে যুদ্ধের ময়দানে সরাসরি লড়াই করেছে। অন্য সকলের সাথে মিলে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর, ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি ছাত্র ইউনিয়ন ঐতিহাসিক এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অস্ত্র জমা দেয়। তখন সংগঠনের পক্ষ থেকে স্লোগান উত্থাপন করা হয়–'রাইফেলের বেয়নেটকে লাঙ্গলের ফলায় পরিণত করো'; 'লাখো শহীদের রক্তে মুক্ত স্বদেশ, এসো দেশ গড়ি'। ছাত্র ইউনিয়ন পাড়ায় পাড়ায় স্বেচ্ছাসেবক ব্রিগেড গড়ে তুলে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ইউনিট চালু করে। রিলিফ নিয়ে জনগণের পাশে দাঁড়ায়, সারাদেশে বৃক্ষরোপণ করে। এছাড়া খেলাধুলা,

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটানোর বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়। বিজয়ের তিন সপ্তাহের মাথায় স্বাধীন দেশের জন্য 'প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি' প্রণয়নের কাজে হাত দেয় ছাত্র ইউনিয়ন। এসব কাজের পাশাপাশি ছাত্র ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা, লুটপাট-দুর্নীতি-অনাচার রুখে দাঁড়ানো, গম চুরি-রিলিফ চুরি-কম্বল চুরি ঠেকানো, সমাজতন্ত্রের ধারায় অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করা ইত্যাদির জন্য ছাত্রসমাজের আন্দোলনকে বেগবান করার পদক্ষেপ নেয়। মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য মুক্তিযুদ্ধের পর ছাত্র ইউনিয়ন দেশের প্রধান ছাত্র সংগঠনের মর্যাদা লাভে সমর্থ হয়। ডাকসুসহ সারা দেশের বিভিন্ন ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয় ছাত্র ইউনিয়ন।

এরপর ইতিহাসের মোড় পাল্টে দেয়ার নানা চক্রান্ত চলেছে। নানা কৌশলে ছাত্র আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়া হয়েছে। ছাত্ররাজনীতিতে নির্লজ্জ লেজুড়বৃত্তি, সন্ত্রাস, দখলদারিত্ব ছাত্রসমাজের শক্তিকে খণ্ডিত করেছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিকৃতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে দাঁড়িয়ে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানপন্থী শক্তির উত্থান, মুক্তিযুদ্ধের একক কৃতিত্ব নেয়ার প্রবণতা আমাদের প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়নসহ বামপন্থীদের ভূমিকাকে স্মরণ করে, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনাকে উপলব্ধি করতে হবে আজকের প্রগতিশীল যোদ্ধাদের। তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে সঠিক ইতিহাস। এই প্রতিকূল সময়ে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, লুটেরা অর্থনীতি, ভোগবাদী সংস্কৃতির বিপরীতে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানীদের আত্মত্যাগ থেকে শিক্ষা নিতে হবে, ঘুরিয়ে দিতে হবে 'চলতি হাওয়া'র রুগ্ন প্রবণতা। ছাত্র ইউনিয়নকে আবারো ছাত্রসমাজের অগ্রবর্তী সংগঠনে পরিণত করার মধ্য দিয়ে আগামীদিনের শোষণমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ করার 'দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধে' নিতে হবে প্রমিথিউসের ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধে পূর্বসূরীদের গৌরবময় ভূমিকা হোক সেই লড়াইয়ে প্রেরণার অফুরন্ত উৎসধারা।

<u>তথ্যসূত্র</u>


- ড. মোহাম্মদ হান্নান, ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস
- আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
- মঈদুল হাসান, *মূলধারা '৭১*
- এম আর আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি
- ছাত্র ইউনিয়নের কাউন্সিল রিপোর্ট ও অন্যান্য দলিল

## মুক্তিসংগ্রামে ছাত্র ইউনিয়ন

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০১১
প্রকাশনা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
২, কমরেড মণি সিংহ সড়ক, পুরানা পল্টন, ঢাকা
মুদ্রণ : লেখনী কম্পিউটার্স
মূল্য : ১০ টাকা

**বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন**